**শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রেক্ষাপট**

প্রেক্ষাপট:-

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সাথে রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী বাংলাদেশের অসংখ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিকদের চোখ বেঁধে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে তাদের নির্যাতনের পর হত্যা করে। চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে থাকায় স্বাধীন বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয়। পরবর্তীতে ঢাকার মিরপুর, রায়েরবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে গণকবরে তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর নিকট আত্মীয়রা মিরপুর ও রাজারবাগ বধ্যভূমিতে স্বজনের মৃতদেহ সনাক্ত করেন।



মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে একটি গণকবর

অনেকের দেহে আঘাতের চিহ্ন, চোখ, হাত-পা বাঁধা, কারো কারো শরীরে একাধিক গুলি, অনেককে হত্যা করা হয়েছিল ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে। যা থেকে হত্যার পূর্বে তাদের নির্যাতন করা হয়েছিল সে তথ্যও বের হয়ে আসে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে প্রকাশিত বুদ্ধিজীবী দিবসের সংকলন, পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও আন্তর্জাতিক নিউজ ম্যাগাজিন ‘নিউজ উইক’-এর সাংবাদিক নিকোলাস টমালিনের লেখা থেকে জানা যায়, বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা মোট ১ হাজার ৭০ জন।[৪]

২০২১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি “শহীদ বুদ্ধিজীবী”-দের সংজ্ঞা চূড়ান্ত করা হয়। সংজ্ঞা অনুযায়ী,

“১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত সময়কালে যেসব বাঙালি সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, রাজনীতিক, সমাজসেবী, সংস্কৃতিসেবী, চলচ্চিত্র, নাটক ও সংগীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং এর ফলে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী কিংবা তাদের সহযোগীদের হাতে শহীদ কিংবা ওই সময়ে চিরতরে নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁরা শহীদ বুদ্ধিজীবী।”[৫]

বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ’ (১৯৯৪) থেকে জানা যায়, ২৩২ জন বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন। তবে তালিকায় অসম্পূর্ণতার কথাও একই গ্রন্থে স্বীকার করা হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৮, মতান্তরে ২৯ তারিখে বেসরকারীভাবে গঠিত বুদ্ধিজীবী নিধন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। এরপর “বুদ্ধিজীবী তদন্ত কমিটি” গঠিত হয়। এই কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়, রাও ফরমান আলী এদেশের ২০,০০০ বুদ্ধিজীবীকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা মতো হত্যাযজ্ঞ চলেনি। কারণ ফরমান আলীর লক্ষ্য ছিল শীর্ষ বুদ্ধিজীবীদেরকে গভর্নর হাউজে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা। বুদ্ধিজীবী তদন্ত কমিটির প্রধান জহির রায়হান বলেছিলেন, ‘এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনষ্ক বুদ্ধিজীবীদেরকে বাছাই করে আঘাত হেনেছে’। তবে ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান নিখোঁজ হন।

তাজউদ্দিন আহমেদ একটি তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেন ১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। কিন্ত, তার ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর দৈনিক আজাদের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনাটি পূর্বেই করা হয় আর এতে সহায়তা করে জামায়াতে ইসলামী ও এর ছাত্র সংগঠন ছাত্রসংঘ। এ হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন ব্রি. জে. আসলাম, ক্যাপ্টেন তারেক, কর্ণেল তাজ, কর্ণেল তাহের, ভিসি প্রফেসর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ডঃ মোহর আলী, আল বদরের এবিএম খালেক মজুমদার, আশরাফুজ্জামান খান ও চৌধুরী মাইনুদ্দিন এদের নেতৃত্ব দেয় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।[৬]

১৯৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনায় রমনা থানায় প্রথম মামলা দায়ের করা হয় (মামলা নম্বর ১৫)। সেখানে আলবদর বাহিনীর চৌধুরী মাইনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামানকে আসামি করা হয়। মামলাটি দায়ের করেন অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিনের বোন ফরিদা বানু।

দিবস ঘোষণা:-

১৯৭১ সালে বছরব্যাপী পাকিস্তান সেনাবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। পরিকল্পিতভাবে ১৪ ডিসেম্বরে সবচেয়ে বেশীসংখ্যক বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এই দিনকে ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ ঘোষণা করেন।